6 July, 2023

বণিক বার্তা

আলোকপাত

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

আমি মূল্যস্ফীতি বলছি

অর্থনীতিশাস্ত্রে অব্যাহত দ্রব্য ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হিসেবেই আমাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ম্যাক্রোইকোনমিকসে আমি অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির হার এবং সামষ্টিক আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধি মুখোমুখি অবস্থানে। পয়েন্টটি বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়ে, বেকারত্ব কমে কিন্তু আমি বেড়ে যেতে থাকি। তবে আমি পরিমিত (শতকরা ৫ শতাংশের কমবেশি) থাকলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা প্রণোদিত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করেন, সামষ্টিক আয়ের পালে হাওয়া লাগে। তবে আমি বেশি বেড়ে গেলে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। তাদের স্বল্প আয়ের ক্রয়ক্ষমতা আমি আরো হ্রাস করে দিই—এটি এক ধরনের দারিদ্র্য করা। তাছাড়া কিছু সুযোগসন্ধানী যোগসাজশে মালামাল মজুদ করে বাজারে জোগান কমিয়ে দিয়ে আমাকে উসকে দেয়। ইকোনমিক রেন্ট বা একচেটিয়া মুনাফা বাগিয়ে তারা গোঁফে তেল দেন।

মুদ্রানীতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

কতিতে লম্বতম্ব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আর স্থানীয়ভাবে নানা কারণে সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বেই আমি দুই অংক অতিক্রম করি। তবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে এমনকি এশিয়ার বহু দেশে জ্বালানি সংকট কাটিয়ে সঠিক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে আমার দাপট অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। তবে বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার নীতিতে দুর্বলতা ছাড়াও উল্লিখিত সুযোগসন্ধানীদের বাণিজ্যমন্ত্রীর ভাষায় 'শক্তিশালী সিন্ডিকেটের' কারণে বাজেটে যা-ই বলা হোক না কেন, আমার দাপট এই সেদিনও ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশে ছিল। আমাকে কেবল মুদ্রানীতি নয়, আরো অনেক বিষয় প্রভাবিত করে। ইকুয়েশন অব এক্সচেঞ্জ বিনিময় সমীকরণ থেকে জানা যায় $P = MV/Q$ যেখানে 'পি' দিয়ে দ্রব্য ও পণ্যমূল্যের লহরকে বোঝায় আর 'কিউ' হলো প্রকৃত সামষ্টিক উৎপাদন বা জাতীয় আয়, 'এম' হচ্ছে মৌলিক মুদ্রা সরবরাহ যা প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করে নির্ধারণ করে এবং 'ভি' হলো মুদ্রা একটি একক বছরে কতবার হাত বদলায় তার নির্দেশক। অর্থাৎ 'কিউ' দিয়ে পণ্য ও সেবার সামগ্রিক সমাহার বা জোগান বোঝায় আর 'এমভি' দিয়ে চাহিদার ক্ষেত্রে সামগ্রিক ক্রয়ক্ষমতা। মুদ্রা সরবরাহ 'এম' বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পায়: বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, বাজেট ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারি কর্জ ইত্যাদি ঘটলেই সমীকরণের উপরের অংশ বৃদ্ধি পায়, বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হয়ে উৎপাদন বা 'কিউ' বাড়তে সময়ের ব্যবধান বা লাগ হয়ে থাকে। সুতরাং 'এম' বাড়লেই আমি বাড়তে থাকি যদি না তাৎক্ষণিক আমদানি (বৈধ অথবা অবৈধ) এবং অতীত বিনিয়োগ থেকে এখন উৎপাদন বৃদ্ধিতে 'কিউ' বেড়ে যায়। অর্থাৎ সিন্ডিকেশনে 'কিউ'-এর অংশবিশেষ দৈনন্দিন বাজারের জোগানটি আটকে দিলেই আমার মাত্রা আকাশচুম্বী হয় এবং সিন্ডিকেটধারীরা উইন্ডফল প্রফিটের মাধ্যমে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যান।

বাংলাদেশের শুরুতে আমার হালচাল

কয়েক শতাব্দী ধরে পশ্চাৎভূমি হিসেবে লুণ্ঠিত-বঞ্চিত পূর্ব বাংলা থেকে ১৯০ বছরে ব্রিটিশ রাজের উপনিবেশ আর অসভ্য পাকিস্তানি আধা উপনিবেশ শাসনে অঢেল ধনসম্পদ লুটপাট হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু; ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা) নামে-শানে-আদর্শে এবং অকুতোভয় সংগ্রামী পথে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধে এক মহাসাগর রক্ত পেরিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অখণ্ড পূর্ববাংলার প্রথম স্বাধীন দেশ হিসেবে নতুন দিবাকর ছিনিয়ে আনে। ১৯৭০-৭১-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকালে কিষাণ-কিষাণী লাঙল-চকম ছেড়ে জয় বাংলার অন্বেষণে যোগ দেন। শ্রমজীবীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৭১-৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সমন্বিত জাতীয় আয় জিডিপি ১১ শতাংশ কমে ৮৫০ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে আসে। মাথাপিছু আয় ১০০ ডলারেরও কম। শিক্ষার শতকরা হার ২৩ ভাগ, গড় আয়ু ৪৩ বছর, শিশুমৃত্যু হাজারে ২০০। রিজার্ভ ১৮ ডলার। গুদামে খাদ্য নেই। মাঠে ফসল নেই। কলকারখানার চাক্কাজাম। জনসন-কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ি, হিউম্যান ফ্যাল্যান্ড-পার্কিনসনের অর্থনৈতিকভাবে না টিকে থাকার অশনিসংকেত তথা টেষ্ট কেস ও অন্যদের অপমানসূচক লাথি-গুতায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্বে বীরের জাতি ঘুরে দাঁড়ায়। সারা বিশ্বকে আমি সত্তর দশকের শুরুতে টালমাটাল করে দিই; খরায় শস্যহানি, মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক পেশি প্রদর্শনে অপরিশোধিত জ্বালানির দাম আমি ১৯৭৩ সালে ব্যারেলপ্রতি ৪ থেকে ১২ ডলারে উঠিয়ে ফেলি, চারদিকে নিত্যপণ্যের জন্য হাহাকার আর আকাশছোঁয়া দাম। রিজার্ভের ১৮ ডলারের সঙ্গে কানাডা ও সুইডেনের খাদ্য ও পণ্য সাহায্য ছাড়াও কিছু নগদ বৈদেশিক মুদ্রা যোগ হয়ে ভারত থেকে ৫০ কোটি ডলার বন্ধুপ্রতিম ঋণ সাহায্য পাওয়া যায়। আইএমএফের সদস্যভুক্তি এবং জাতির জনকের অসাধারণ দূরদর্শিতার ফলে বিশ্বব্যাংকসহ বাজার অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের নিজস্ব ধারার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। প্রায় বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সার, বীজ, কীটনাশক ও কৃষিঋণ পেয়ে যান বঙ্গবন্ধুর সুহৃদরা—কিষাণ-কিষাণী। যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০ থেকে প্রাপ্ত কাউন্টার পার্ট ফান্ড দিয়ে মুরগি পালনে বিপ্লব এবং পল্লী বিদ্যুতায়নে শিল্প-কলকারখানায় প্রাণ সঞ্চার হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হয় বাজেটের যথাক্রমে ২০ দশমিক ৪ ভাগ ও ১৮ ভাগ। কৃষিপণ্যসহ সব খাতে বঙ্গবন্ধুর উপহার আসে অর্থনীতির বিপুল পুনরুত্থানে। ১৯৭৪-৭৫ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। আমি ১৯৭০-৭১ সালে শতকরা ৬২ ভাগের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে নেমে আসি শতকরা ৪২ ভাগে।

১৯৯৬-২০০১ সময়কালে বাংলাদেশে আমার আয়েসি সময়

পঁচাত্তরের বিয়োগান্তক আর নৃশংসজনক হত্যাকাণ্ডে জাতির পিতার শাহাদাতের পরই আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অবাধ বাজার অর্থনীতির ধারা এবং পাকিস্তানি আদর্শ, সংস্কৃতি ও চেতনার পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা হয়। ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ সংগ্রামী পথ পেয়ে জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই জনকল্যাণে সুদূরপ্রসারী পথপরিক্রমা শুরু করে। বিদ্যুৎপ্রাপ্তির সুরাহা হতে থাকে। আপৎকালীন অগ্রাধিকারে 'মাঝে মাঝে আসা' বিদ্যুৎ সারাক্ষণ জ্বলে। উন্নয়ন সহযোগীদের তীব্র বিরোধিতা পায়ে ঠেলে কৃষি খাতে ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকি দেয়া হয়। উৎপাদনে জোয়ার আসে। ১৯৯৮ সালে দীর্ঘ প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর ১৫ লাখ টন খাদ্য সরকারি গুদামে মজুদ করে ১ দশমিক ৫ কোটি মানুষকে নয় মাসব্যাপী ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে খাওয়ানো হয়। দেড় কোটি লোক বাজারে না গিয়েই চাল-গম পেয়ে যান। আমি চুপসে যাই। এটি আরো এ কারণে ঘটে যে বাজেট ঘাটতি পূরণে জনগণের কাছ থেকে সরকার সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদি মাধ্যমে সরাসরি কর্জ করতে ক্রয়ক্ষমতার কেবল হস্তান্তর ঘটে, নতুন করে সৃষ্টি হয়নি। নিবিড়ভাবে বাজার তদারকি করা হয়; শুধু লোক দেখানো

> উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে এমনকি এশিয়ার বহু দেশে জ্বালানি সংকট কাটিয়ে সঠিক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে আমার দাপট অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। তবে বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার নীতিতে দুর্বলতা ছাড়াও উল্লিখিত সুযোগসন্ধানীদের বাণিজ্যমন্ত্রীর ভাষায় 'শক্তিশালী সিন্ডিকেটের' কারণে বাজেটে যা-ই বলা হোক না কেন, আমার দাপট এই সেদিনও ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ ছিল

বা টিভি প্রদর্শনে নয়। রাজনীতিকরা ব্যবসায় নামেননি, ব্যবসায়ীরাও রাজনীতিতে যোগ দেননি। অবশ্য আমদানিও বেড়ে যায় (কিছু কিছু অবৈধ)। অর্থাৎ সমীকরণের ডিনোমিনেটর (নিচের অংশ) উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানিতে বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার-কর্জ (অর্থাৎ নোট ছাপানো) বন্ধ থাকে। ফলে পুরো ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে আমি থাকি বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বনিম্ন অবস্থানে, ২০০০-০১ সালে শতকরা ১ দশমিক ৭ শতাংশে (অবিশ্বাস্য তাই না!)।

২০০৬-০৭ এ দুই বছর

সুনামির কাল। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের, বিশেষ করে বিশ্বমন্ত্র খাদ্যদ্রব্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা সামাল দিতে বাধ্য হয়। ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব কুমার মুখার্জি প্রতিশ্রুত ৫০ লাখ টন চাল আমদানির আলাপ-আলোচনায় একজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব দেয়ায় তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। আমি এক লাফে ১৩/১৪ শতাংশে উঠি মূলত ফুড ইনফ্ল্যাশন-জনিত কারণে।

২০০৯ থেকে অদ্যাবধি

যতিবিহীন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্ববাসীর নজর কাড়ে। রফতানি আয় (৫০ দশমিক ৫৬ কোটি মার্কিন ডলার) ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে রেকর্ড সৃষ্টি হয় ২ হাজার ২০০ কোটি ডলারে। গড় আয়ু ৭৩ ছুঁই ছুঁই আর মানব উন্নয়ন সূচক শূন্য দশমিক ৬৬২ বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় স্থানে ও বিশ্বের ১২৯ ক্রমিকে নিয়ে যায়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের হিসাবে জেন্ডার প্যারিটি গ্লোবাল গ্যাপ ইনডেক্সে শূন্য দশমিক ৭২২ স্কোর নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে, এশিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে ও বিশ্বের ৫৯তম স্থানে উঠে আসে। পৃথিবীর এ ৩৫তম অর্থনীতি কভিড সামলানোর সফলতায় পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় এবং কভিড আক্রান্ত বছরগুলোসহ কোনো বছরই ইতিবাচক ছাড়া নেতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পড়েনি। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের এবং সম্প্রতি ভারতের মাথাপিছু আয়কে ছাড়িয়ে যাওয়া দেশটির সরকারপ্রধান পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, রোহিঙ্গাদের সামরিক আশ্রয় প্রদান, লিঙ্গসমতা ইত্যকার বিষয়ে বিশ্বনন্দিত হয়েছেন। ইটলসে ২০১২ ও ২০১৪ সালে অসীম কুশলী নেতৃত্বে ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্রভূমিতে ২০০ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমায় এবং মহিসোপানে মালিকানা লাভ করে বাংলাদেশ আজ সুনীল অর্থনীতির বিশাল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। সফল দারিদ্র্য নিরসনে, অবকাঠামো নির্মাণে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অর্জন করেছে আস্থা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়কালীন ইতিবাচক ভাবমূর্তি। ২০১৭ সালে মাথাপিছু জিএনআই ১ হাজার ৭০০ ডলার (২০১৫), অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (প্রয়োজন<০.৩৩ আমাদের ০.২৫) ও মানব উন্নয়ন সূচক (প্রয়োজন< ০.৬৬ আমাদের ০.৭৫) পরীক্ষাত্রয়ে একযোগে উত্তীর্ণ হয়ে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের চৌকাঠ পার হয়েছে বাংলাদেশ। তাই ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের হাতছানি নাগালের মধ্যে বলেই মনে হয়। তবে আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য (গিনি সহগ এখন শূন্য দশমিক ৪৯); দুর্নীতি ও অপচয় (প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লে জরিমানার বদলে প্রকল্প ব্যয়ে বাড়ানো হয়); কর-জিডিপি অনুপাত এখন ০৮ এরও কম যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন; বিপুল রফতানি রাজস্ব বিদেশে থেকে যায় (রিটেনশন বরাদ্দের অতিরিক্ত); করখেলাপ, ঋণখেলাপ, আন্ডার ও ওভার-ইনভয়েসিংয়ে বিপুল অংকের মুদ্রা পাচার; রাজনীতির ব্যবসায়ীকরণ, প্রায় ১৫ বছর টাকাকে অতিমূল্যায়িত রেখে সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির ধাক্কায় এক লাফে শতকরা ২৫ ভাগ অবমূল্যায়ন; একাধিক বিনিময় হার; সরকারি ও কার্ব মার্কেট রেটে (৬/৭ টাকার ব্যবধান), রেমিট্যান্স প্রদানকারীদের প্রণোদনা দেয়ার নামে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতি ডলারে ২ টাকা ৫০ পয়সা কুক্ষিগত করার সুযোগ সৃষ্টি; আর্থিক ও ব্যাংক খাতে বাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে না পারায় সেবার নিম্নমান এবং আমানতে প্রদেয় বনাম বিনিয়োগে ধার্য করা সুদে অস্বাভাবিক ফারাক এবং হিসাবে ছয়-নয়; ব্যক্তি খাতের মালিকানা শতকরা ৯২ ভাগ আমানতকারী হলেও মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থে এবং জাতির পিতার সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক দর্শনের বিপরীতে বৈষম্য সৃষ্টিকারী একটি ব্যাংকে একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের মেয়াদ বাড়ানো (এখন অবিশ্বাস্য ১২ বছর); ব্যাংকের ঋণখেলাপিদের জামাই আদরে লালন-পালন এবং নিত্যপণ্যের বাজার স্বল্পসংখ্যক অতি মুনাফাপ্রত্যাশীর সিন্ডিকেট বিনা তদারকিতে দেয়ার ফলে সরকারের হিমালয়সম অর্জন সত্ত্বেও জনদুর্ভোগ বেড়ে চলেছে। আমার দাপট সারা বিশ্বে এখন আয়ত্তের মধ্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত এক বছরে আমাকে ৯ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে গত ডিসেম্বরে আমি ১০ দশমিক ৫ শতাংশে উল্লম্ফন দিলেও এখন ৬ শতাংশ। ভারতে আমি গত বছর জুনে ৭ শতাংশ ছিলাম; এখন তারা আমাকে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছে। অবশ্য অনেক দেশেই আমি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি মাত্রায় গর্জন করছি। তবে প্রবৃদ্ধির মতেল বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তর করতে হলে অবশ্যই সিঙ্গহস্তে দুর্নীতি ও অপচয় দমন, মুদ্রা পাচার, কর ও ঋণখেলাপ দমনের সঙ্গে আমাকেও দৃঢ়হস্তে লাগাম দিতে হবে। কর্তাদের সিন্ডিকেট ভেঙে দিলে অর্থনীতিতে কেয়ামত এসে যাবে অথবা বাংলাদেশের অর্থনীতি অগভীর বলেই সারা বিশ্বে আমি কমলেও বাংলাদেশে এখনো শতকরা ৯ দশমিক ৭৪ ভাগ—এসব কোনো কাজের কথা নয়। সিন্ডিকেট সদস্যদের লাইসেন্স বাতিল করে আমদানিকারকের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়ানো যেতে পারে। ১৯৯৮-এর মতো সরকারি গুদামে (গুদামক্ষমতা ২ দশমিক ৮ মিলিয়ন থেকে ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন টনে বাড়ানো তেমন কঠিন হবে কেন!) চাল, গম, পেঁয়াজ, চিনি, সয়াবিন ইত্যকার নিত্যপণ্যের বিপুল মজুদ করে তা দিয়ে বাজার ভাসিয়ে দিলে সিন্ডিকেট সদস্যরা ও তাদের অবৈধ মজুদ বাজারে আনতে বাধ্য হবেন। একাধিক বিনিময় হার অবশ্যই অবিলম্বে পরিত্যাজ্য। আর্থিক ও ব্যাংক খাতে সংস্কার প্রয়োজন। করদাতার সংখ্যা বাড়িয়ে কর রাজস্ব আদায়ে কমপক্ষে ৩০ লাখ করদাতাকে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটিতে রূপান্তর করতে হলে কী কী করতে হবে তাও জানা, শুধু সদাশয় সরকারের সদিচ্ছা প্রয়োজন। উন্নয়ন সহযোগীদের 'পরামর্শ' বাদ দিয়ে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তুল্য সেভিংস সার্টিফিকেটকে আকর্ষণীয় করে তার মাধ্যমে 'আমি নিরপেক্ষ' সম্পদ জনগণ থেকে সরকারে হস্তান্তর করা নানাভাবে কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য শুভ হবে। অকটেন ও ডিজেলের দাম না কমিয়ে বিপিসির সাংবাৎসরিক লাভের অর্ধেক সরকারি কোষাগারে নিতে হবে। তবে পণ্য পরিবহনে ডিজেল ব্যবহারে ভর্তুকি দিতেই হবে। জাতির পিতার একান্ত চিন্তা প্রতিটি গ্রামে উৎপাদন ও বিপণন সমবায় গঠন করা জরুরি। নতুবা ছোট ছোট কোম্পানি গঠন করে পদ্মা, বঙ্গবন্ধু যমুনা ও অন্যান্য বিপুল সংযুক্তি সৃষ্টিকারী অবকাঠামোর মাধ্যমে পণ্য বাজারজাত হলে উৎপাদনকারীরা বর্তমানের চেয়ে বেশি মূল্য পাবেন, বিশেষ করে শহুরে ভোক্তারা দেবেন অনেক দাম। অর্থাৎ আমার দাপট কমবে। অনুরূপভাবে প্রয়োজন হলে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের প্রসার ঘটিয়ে কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে লালন ও ব্যাংকব্যবল উদ্যোক্তা হিসেবে রূপান্তর করা হলে দারিদ্র্য আরো কমবে, বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং আমি চুপসে যাব। তাছাড়া হাতের কাছে থাকা পরীক্ষিত নীতি কৌশলে ঔঁড়া দুধ, ফার্নিচার, নির্মাণসামগ্রী, সিএনজি, খেলাধুলার সরঞ্জাম, হাতঘড়ি, গাড়ি নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা দিলেও সাড়ে চৌদ্দ বছরের দৃষ্টিনন্দন বিশাল অর্জনের সফল সমাপ্তিতে সোনার বাংলার স্বপ্নতীর্থ আরো কাছে আসবে।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন: অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও সমাজচিন্তা বিষয়ে চর্চা করেন। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য (১৯৯৫-৯৮) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর (১৯৯৮-২০০১)